খাদ্য : সর্বজনের অধিকার ও বিশ্ব সাম্রাজ্য

আনু মুহাম্মদ

বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেলেও প্রায়ই সারাবিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে অনেকগুলো দেশে খাদ্য নিয়ে বিক্ষোভ বিদ্রোহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অনাহারী মানুষের সংখ্যা কমেনি, বরং কোথাও কোথাও তা বাড়ছে। মাঝেমধ্যেই নীরব দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। কয় বছর আগে তিউনিসিয়া, ইয়েমেন ও মিসরে যে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গেও খাদ্য সংক্রান্ত মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৪-এর মতো দেশব্যাপী বড় আকারের দুর্ভিক্ষ পরে আর দেখা না গেলেও অনাহার বা খাদ্য সংকট থেকে দেশ কখনোই মুক্ত হয়নি। বহু দেশে রাষ্ট্রীয় নীতি ও উন্নয়ন দর্শনে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি ক্রমে আড়ালে চলে গেছে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক আলোচনা বিতর্কে ভূমি সংস্কার ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি এখন প্রায় অনুপস্থিত।

২০০৭-০৮ সময়কাল থেকে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকটের নতুন চেহারা, খাদ্য বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদনের সাথে উন্নয়ন নীতির সংঘাত এবং দেশে খাদ্যদ্রব্যের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধিতে বাংলাদেশে ও বিশ্বব্যাপী খাদ্য প্রশ্ন নতুন করে জোরদার হচ্ছে।

৩৩ বছর আগের চিত্র

৩৩ বছর আগে, তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আমি 'আন্তর্জাতিক চক্রান্ত' শিরোনামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম। 'চক্রান্ত' শব্দটি শিরোনামে থাকলেও এটি নিছক চক্রান্ত বিষয়ক তথ্য আর আলোচনা ছিল না। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতি প্রকৃতির ধারা অনুসন্ধান করে তার মধ্যে খাদ্য প্রশ্নে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীদারের ভূমিকা পরীক্ষা করাই ছিল এর লক্ষ্য। মূল বিষয় ছিল বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করে বিশ্ব গতিপ্রকৃতি ও তাতে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করা। সেই আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সিরিজে অস্ত্র, ওষুধ, জ্বালানি, বহুজাতিক কোম্পানি ছাড়াও ছিল খাদ্য বিষয়ক লেখা।

১৯৮১ সালের 'আন্তর্জাতিক চক্রান্ত : খাদ্য' শিরোনামের সেই লেখায় আমি প্রধানত বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন ও অনাহারের বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধান করেছিলাম। তা করতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদন, প্রাপ্যতা, দারিদ্র্য, বিশ্ব রাজনীতি, বিশ্ব ক্ষমতার বিন্যাস নিয়ে আলোচনা এসেছিল। বিশ্ব খাদ্য সংকট নিয়ে রচিত 'হাউ দ্য আদার হাফ ডাইজ' গ্রন্থের লেখক সুসান জর্জের একটি হিসাব উপস্থিত করেছিলাম পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে। ৩৫০ পৃষ্ঠার সেই গ্রন্থ সম্পর্কে সুসান বলেছিলেন, 'যদি এই বই পড়তে আপনার ছ'ঘণ্টা সময় লাগে তবে নিশ্চিত জানবেন এই বই শেষ করবার আগেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনাহারে কিংবা অনাহারজনিত রোগে আড়াই হাজার লোক মৃত্যুবরণ করবে।'

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেলেও ক্ষুধা, অনাহার এখনো বিশ্বের প্রায় দুই শ' কোটি মানুষের জীবনসঙ্গী। বিশ্বে খাদ্য নিয়ে ফাটকাবাজারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সংকট এখন এক নতুন গতি নিয়েছে।

৩৩ বছরে পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কিন্তু বৈপরীত্যের চিত্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং বেশ কিছু উপাদান যুক্ত হয়েছে, যাতে পুঁজির বৈশ্বিক গতিমুখ খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নকে আরো নাজুক করে তুলেছে। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেলেও ক্ষুধা, অনাহার এখনো বিশ্বের প্রায় দুই শ' কোটি মানুষের জীবনসঙ্গী। বিশ্বে খাদ্য নিয়ে ফাটকাবাজারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সংকট এখন এক নতুন গতি নিয়েছে। কৃষিজমি চলে যাচ্ছে।

সে সময় বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি কেমন ছিল? কেন অনাহার প্রকট আকার ধারণ করেছিল? উৎপাদন কি কমেছিল? বিশ্বব্যাংকের দলিলপত্র থেকেই এসব চিত্র অনুসন্ধান করেছিলাম। মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভাগ করে, ১৯৬৯-৭১ সালের মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ১০০ ধরে, উৎপাদন সূচক উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে ১৯৬৯-৭১-এর তুলনায় ১৯৮০-৮১-তে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদনের সূচক চিত্রটি ছিল এ রকম : নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ (যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত) : ৯৮, মাঝারি আয়ভুক্ত দেশ : ১০৫, উচ্চ আয়ভুক্ত দেশ : ১০৬, এবং এর বাইরে সমাজতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত দেশ : ১১০। সব গড় করে বিশ্বে সামগ্রিক উৎপাদন বিবেচনায় মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৮০ সালে দাঁড়িয়েছিল ১০৫। সুতরাং উৎপাদন বিবেচনায় অনাহার, দুর্ভিক্ষের কোনো কারণ ছিল না। মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছিল। বলাই বাহুল্য, ৩০ বছর পরে তা আরো অনেক বেড়েছে।

বিশ্বে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ভোগের বিতরণে ১৯৮০ সালের যে চিত্র ঐ লেখায় উপস্থিত করেছিলাম তা এখনো পরিবর্তন হয়নি। সেই সময়কার তথ্য অনুযায়ী, 'শিল্পে উন্নত' দেশসমূহের জনসংখ্যা 'যদিও বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ, তবুও তারা বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ভোগ করেন এবং তাদের পশু-পাখির জন্য বিশ্বের উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ যায়। বাকি খাদ্যশস্য বিশ্বের শতকরা ৭৫ জন মানুষের জন্য অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট ২৫ ভাগের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আবার অনুন্নত বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০ ভাগের আয়ত্তে।'

বদ্ধমূল বিশ্বাস হিসেবে একটি ধারণা এখনো অনেকের মধ্যে শক্তভাবে আছে, এবং এটা প্রচারণায়ও ব্যবহার করা হয় যে, অধিক জনসংখ্যার কারণেই বাংলাদেশের মতো দেশে খাদ্য সংকট, অনাহার ও দারিদ্র্য রয়েছে। ১৯৮১-র লেখায় এই বিষয়টি পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি কয়েকটি দেশে মাথাপিছু জমির প্রাপ্যতা দেখেছিলাম। এগুলো হলো (মাথাপিছু হেক্টরে)–জাপান : ০.০৫, তাইওয়ান : ০.০৬, হল্যান্ড : ০.০৬, উত্তর ভিয়েতনাম : ০.১০, চীন : ০.১৩, ইন্দোনেশিয়া : ০.১৫, বাংলাদেশ : ০.১৬, দক্ষিণ কোরিয়া : ০.১৭, ভারত : ০.৩০, পাকিস্তান : ০.৪০ ও বলিভিয়া : ০.৬৩। এই তথ্য থেকে যে পরস্পরবিরোধী চিত্র পাওয়া যায় তার সারসংক্ষেপ করে আমি লিখেছিলাম, এই দেশগুলোর মধ্যে মাথাপিছু

জমির পরিমাণ যেসব দেশে তুলনামূলকভাবে বেশি, সেসব দেশে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া) খাদ্য সংকট, অনাহার ও দুর্ভিক্ষও দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে মাথাপিছু তুলনামূলক কম জমির দেশগুলোতে (গণচীন, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান, হল্যান্ড) হয় খাদ্য ঘাটতি নেই, নয়তো খাদ্য ঘাটতি এবং অনাহার দুটোই অনুপস্থিত।

জনসংখ্যা ও দুর্ভিক্ষের সম্পর্ক নিয়ে সমাজে যে বদ্ধবিশ্বাস জারি ছিল তা খণ্ডন করতে গিয়ে, সেই সময়ের চিত্র উপস্থাপন করে আমি লিখেছিলাম, 'বলিভিয়াতে দুর্ভিক্ষ যেন চিরন্তন, সেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা মাত্র ৫ জন, কিন্তু হল্যান্ডে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা হচ্ছে ৩২৬ জন, কিন্তু সেখানে দুর্ভিক্ষ নেই। গণচীনের জনসংখ্যার ঘনত্ব আফ্রিকার দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ আফ্রিকার দেশগুলোতে প্রতিবছর দেখা যায়, চীনে নয়।' সেই চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, কিন্তু সেখানে পুঁজিমুখী সংস্কার প্রক্রিয়ায় জৌলুস বৃদ্ধির পাশাপাশি এখন অনাহারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রেও অনাহারী মানুষের সংখ্যা কম নয়।

যে সময়গুলোতে খাদ্যাভাবে বিশ্বের বহু অঞ্চলের মানুষ আক্রান্ত, সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ভর্তুকি দিয়ে জমি পতিত রাখার ঘটনা বার বার দেখা গেছে। এর প্রধান কারণ উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারে খাদ্যশস্যের দাম কমে গেছে বা কমে যাবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, তাই বাজার দাম ও মুনাফার হার ঠিক রাখার জন্য খাদ্যশস্য নষ্ট করা বা জমি পতিত রাখার ঘটনা ঘটে বিভিন্ন সময়কালে। ঐ লেখায় আমার দেয়া উদ্বৃতি ছিল, '৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের অতি উৎপাদনের পর ১৯৬৮-৭০ সময়কালে সে দেশের পুরো আবাদি জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ পতিত রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে একই কারণে দুই কোটি হেক্টর জমি পতিত রাখা হয়; এবং এ সময়ে খামার মালিকদের ভর্তুকি দেয়া হয় প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। ১৯৬৯-৭২ সময়কালে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী রাষ্ট্রগুলো একই হারে উৎপাদন অব্যাহত রাখত তবে অতিরিক্ত ৯ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো।' অথচ এর পরই শুধু আশি লাখ টন খাদ্যের ঘাটতিতে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা : ধারণা ও বৈশ্বিক চিত্র

গত ৩৩ বছরে বিশ্ব খাদ্য অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যেসব নতুন উপাদান দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে তার মধ্যে যেমন ষাটের দশকের তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি আছে আরো নতুন কিছু উপাদান। আছে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের' কর্মসূচি। এসব বিষয়ে ক্রমে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার আগে বর্তমান সময়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা' ধারণা ও তার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে খাদ্যদ্রব্যের দাম ও সেই সম্পর্কিত কিছু বিষয় খেয়াল করি।

১৯৯৬ সালে রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও বা ফাও) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে 'খাদ্য নিরাপত্তা' বলতে বোঝানো হয়েছে এ রকম একটি পরিস্থিতি, যেখানে সকল মানুষ সকল সময়ে সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের জন্য, পুষ্টি ও পছন্দ পূরণের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ ও পুষ্টিযুক্ত খাওয়া পাবেন।

'খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিত করতে গেলে এর অপরিহার্য দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় নিম্নরূপে–

১. ক্ষুধা নিবারণ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন। খাদ্য মানে শুধু শস্য নয়; দুধ, মাছ, মাংস, ফল, পানি ও পানীয় ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করতে হবে।

২. খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে জমি, ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত পানি এবং পরিবেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটি নিশ্চিত করা। কেননা এসব ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্য উৎপাদনই ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন অধিকতর নিরাপত্তাহীন করে তোলে।

৩. প্রয়োজনীয় খাদ্য যাতে জনগণের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব হয় সেজন্য তাদের স্বত্বাধিকার ও ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৪. খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে তার পুষ্টিমান ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৫. যে কোনো প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো বিপর্যয়ে খাদ্য জোগান বিঘ্নিত হলে তা যেন জনগণের খাদ্য প্রয়োজন বিপর্যস্ত করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা।

বলাই বাহুল্য, বর্তমান বিশ্বে খাদ্য পরিস্থিতি খাদ্য নিরাপত্তার উপরোক্ত শর্তপূরণ থেকে অনেক দূরে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক কর্মকর্তা কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, এই বিশ্বে মাটি, পানি ও মানুষের যে বিন্যাস আছে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রায় ৬,০০০ কোটি মানুষের সব ধরনের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। অথচ বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যা এর প্রায় ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৭০০ কোটির কিছু বেশি। যে জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ এই ধরিত্রীর পক্ষে সম্ভব তার ৯ ভাগের ১ ভাগ বিশ্ব জনসংখ্যা হবার পরও অন্তত ২০০ কোটি মানুষ বছরের বহুদিন অর্ধাহার বা অনাহারে থাকছে। অনাহারে বা অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও কমেনি। এর পেছনে বড় কারণ খাদ্যশস্যের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি, যার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অসংগতিপূর্ণ।

বর্তমান পর্বে বিশ্বজুড়ে চালের দামে কিছু ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয় ২০০০ সালের পর থেকেই। ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম ছিল টনপ্রতি ১৭০ মার্কিন ডলার। থাইল্যান্ডে ২০০২ পর্যন্তও টনপ্রতি চালের দাম ছিল ১০৭ মার্কিন ডলার। ২০০৪-০৫ সালে এই দাম ৩০০ ডলারে উঠে যায়। তার পরই ক্রমাগত তা বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে গমের দাম শতকরা ৭৭ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়, সে সময় চালের দাম বেড়েছিল শতকরা ১৬ ভাগ। ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী চালের দাম বাড়ে শতকরা ১৪১ ভাগ (ইকোনমিস্ট, ১৯ এপ্রিল ২০০৮)। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের এই মূল্যবৃদ্ধি ছিল অভূতপূর্ব।

২০০৮-১১-এর বিভিন্ন সময় খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা হয় বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মিসর, মৌরিতানিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, সেনেগাল, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেনে। হাইতিতে সংকট ভয়াবহ আকার নেয়। সব দেশের খবর ঠিকভাবে মিডিয়ায় আসেনি। খাদ্য নিয়ে সংঘাতে একমাত্র ক্যামেরুনেই নিহত হয়েছে ২৪ জন। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট সে সময় বলেছেন, এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্বে আরো ১০ কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারতসহ বহু দেশে 'দাঙ্গা' প্রকাশিত হয়নি, তবে এই দেশগুলোতেও এই সময়ে অনাহারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়, বিক্ষোভের বহু

ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে বেসরকারি গবেষণা অনুযায়ী, খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০৮ সালে নতুন করে আরো ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে বিডিআর পরিচালিত স্বল্পমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বাজারের চাইতে কম দামে খাবার সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান রেশন কার্ড পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকটে বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো আপাত দৃষ্টিতে নড়ে উঠেছিল। ২০০৮ সালে জাতিসংঘের মহাসচিবের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ উচ্চ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট মোকাবিলায় বড় তহবিল দাবি করেন জাতিসংঘের মহাসচিব। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন 'গরিব' দেশকে বীজ কেনার জন্য ১৭০ কোটি ডলার দেয়া হবে। তাঁরা এই অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন 'নীরব সুনামি' বলে। ইকোনমিস্ট ১৯ এপ্রিল 'দ্য সাইলেন্ট সুনামি' শিরোনামে বিশেষ সংখ্যাই প্রকাশ করে। বলাই বাহুল্য, বীজ কেনার জন্য অর্থ সাহায্য মানে খাদ্য সংকটের সমাধান নয়, বরং কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানির পথ প্রশস্ত করা। এর তাৎপর্য পরে আলোচনায় আসছে।

যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউএসএইডসহ এসব কেন্দ্র যে ভাষায় তখন খাদ্য সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেভাবে খাদ্য সংকটকে উপস্থিত করেছে এবং তা মোকাবিলার পথ দেখিয়েছে তাতে এটা মনে হতে পারে যে, এই সংকট সৃষ্টিতে তাদের কোনো ভূমিকা নেই, বরং তারা সব সময় খাদ্য সংকট সমাধানেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু তথ্য ও ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণ বরং এর বিপরীত চিত্রই আমাদের সামনে হাজির করে।

বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যেসব দেশে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে তার মধ্যে হাইতি অন্যতম। কিন্তু আগে হাইতির পরিস্থিতি এ রকম ছিল না, বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধিতে তার বিপর্যস্ত হবারও কথা ছিল না। কিভাবে সত্তরের দশকে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হাইতি ক্রমে খাদ্য সংকটের দেশে পরিণত হলো সেটা লক্ষ্য করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৬ সালে পছন্দসই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইএমএফ তাদেরকে ঋণ দেয় এই শর্তে যে, হাইতির চালসহ কৃষিদ্রব্যের উপর তাদের শুল্ক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে নিতে হবে, এবং বাজার উন্মুক্ত করতে হবে। দুই বছরের মধ্যে মার্কিন ভর্তুকিকৃত চালে হাইতির বাজার ছেয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশে শুধুমাত্র চালের জন্যই প্রতিবছর এক বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেয়। ভর্তুকির কারণে সেখানে চালের দাম কম থাকে। উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী, হাইতির কৃষকদের পক্ষে মার্কিন খাদ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ১৯৯৪ সালে তথাকথিত 'মার্কিন সহযোগিতার' বিনিময়ে বাজার আরো উন্মুক্ত করা হয়, দেশের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে সেই জমি রপ্তানিমুখী অন্য দ্রব্য উৎপাদন বা অকৃষি খাতে নিয়োগ করা হয়। ধসে পড়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের কৃষিব্যবস্থা। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রস্তাবিত নীতি বাস্তবায়ন এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ফেলায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধির পেছনেও নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও তৎপরতা কার্যকর আছে। ২০০৮ সালের শেষ থেকে খাদ্যশস্যের দামের নিম্নগতি দেখা যায়, কিন্তু তা আবারও একটু একটু বাড়তে থাকে ২০০৯-এর শেষ থেকে। এই বৃদ্ধির হার আরো বাড়তে থাকে ২০১০ সালের জুলাই-আগস্ট থেকে। ২০১১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা ফাও জানায়, একটানা সাত মাস ক্রমাগত বৃদ্ধির পর সেই বছরের জানুয়ারি মাসে বিশ্ব খাদ্য মূল্যস্তরে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে। এই তারিখে সংস্থার ওয়েবসাইটে 'আপডেটেড ফাও ফুড প্রাইস ইনডেক্স' অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৯০ সালে বিশ্ব খাদ্য মূল্য সূচক পরিমাপ শুরুর পর ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে তা সর্বোচ্চ (মুদ্রায় ও প্রকৃত উভয় অর্থেই) ২৩১ পয়েন্টে পৌঁছায়। শুধু শস্যের মূল্য সূচক অবশ্য এখনো ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় ১১ পয়েন্ট কম আছে। শস্য মূল্য সূচক এক মাসের মধ্যে ৩ পয়েন্ট বেড়ে জানুয়ারিতে ২৪৫ হয়েছে। সবচাইতে বেশি বেড়েছে চিনির দাম, এর সূচক এখন ৪২০; দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ২২১; নানা রকম রোগ দেখা দেয়ায় সবচেয়ে কম বেড়েছে মাংসের মূল্য সূচক, ১৬৬।

২০১৪ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪ ভাগ। ২০১২ সালের আগস্ট থেকে যে মূল্যহ্রাসের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা উল্টোযাত্রা। ২০১৩ সালের উচ্চ ফলন সত্ত্বেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। (http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-price-watch-may-2014)

অন্যদিকে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সূত্র অনুযায়ী, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে খাদ্যের মূল্য সূচক ২০১০ সালের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমে ১৯৬.৬ দাঁড়ায়। দুগ্ধজাত দ্রব্যের দাম সবচাইতে বেশি কমে, তারপর তেল ও চিনি।
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

২০০৮ থেকে কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। ফটকাবাজারি বিনিয়োগের ধরন এই দুইয়ের দামের গতির মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করেছিল। এ নিয়ে আরো বিশ্লেষণের আগে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি কিংবা সংকটের স্বরূপ দেখা যাক।

বাংলাদেশে কৃষি ও খাদ্যনীতি

বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের জন্য জনসংখ্যা দায়ী–এ রকম কথা বহুল প্রচলিত। কিন্তু অনেক দেশে মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্যতা কমলেও, তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্যতা ১৯৭২-এর তুলনায় এখন বেড়েছে। ১৯৭২-এর সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় এখন দেশে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৪০ লাখ। সে সময় মোট খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদন ছিল এক কোটি টন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-১০ অর্থবছরের খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৩১ লাখ টনের উপর। ২০১০-১১ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩ কোটি ৬০ লাখ টন, ২০১৩-১৪ সালে ৩ কোটি ৭৭ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। অর্থাৎ জনসংখ্যা যেখানে হয়েছে দ্বিগুণের একটু বেশি, খাদ্য উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ গুণ।

তার পরও দেশে সরকারি হিসাবে এখনো ৫ কোটির বেশি মানুষ, প্রচলিত সংজ্ঞার যে দারিদ্র্যসীমা, তার নিচে বাস করেন। শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা প্রচলিত দারিদ্র্যসীমার একটু উপরে আছেন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁদের সামাজিক অবস্থানে

পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ যথেষ্ট খাদ্য ও যথাযথ পুষ্টিমানসহ 'খাদ্য নিরাপত্তা'র সামগ্রিক শর্তাবলি বিবেচনায় দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।

দেশে খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার এই পরিস্থিতি খুবই বেমানান। এই অসংগতি শুধু যে টিকে থাকছে তা-ই নয়, বরং ক্রমেই আরো জটিল আকার ধারণ করছে। কেন? খাদ্য নিয়ে প্রচলিত মূলধারার আলোচনা যেভাবে নিছক খাদ্য উৎপাদন, বাজারে জোগান এবং দামের মধ্যে ঘুরপাক খায় তা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। আরো প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর আমাদের সন্ধান করতে হবে। খাদ্য মানেই শুধু শস্য নয়, তাহলে খাদ্য উৎপাদনের বিশদ চিত্র কী? কেন খাদ্য উৎপাদনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়? কেন জোগান থাকা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে? কেন অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী তার দাম পায় না, কিন্তু ভোক্তাকে কিনতে হয় অনেক বেশি দামে? কেন বাজারে সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য একদিকে দেখা যায় জমকালো আকর্ষণীয়, কিন্তু অন্যদিকে জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়? কেন ১২ কোটি মানুষ তার ন্যূনতম খাদ্যও ক্রয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়? বিশ্বপুঁজির ক্রিয়া কিভাবে বাংলাদেশের মতো দেশের এই অসংগতি সৃষ্টিতে সক্রিয়?

খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রচলিত অধিপতি অর্থশাস্ত্র থেকে পাওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির সঙ্গে গত কয়েক দশকের একরৈখিক নীতি সম্পর্কিত, যা প্রধানত এই অর্থশাস্ত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংক ইউএসএইড গোষ্ঠী নির্ধারণ করেছে। এবং নিজের স্বার্থে তার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে দেশীয় শাসকশ্রেণি, নতুন নতুন সুবিধাভোগীও যোগ হচ্ছে সাথে।

ষাটের দশকে অন্যান্য দেশের মতো এই অঞ্চলেও তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব'-এর যাত্রা শুরু। এর মাধ্যমে এই দেশে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেশীয় সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় বীজ ও উৎপাদনব্যবস্থার ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটিয়ে বহুজাতিক সংস্থার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা। এর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই পরবর্তী নীতি ও ব্যবস্থাগুলো গৃহীত হয়। এগুলো আবার সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারের অংশ হিসেবেই প্রণীত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ এই অঞ্চল থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষিনীতি, ভূমিব্যবস্থা এবং দেশের উপর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আধিপত্য কিছুই পরিবর্তন করেনি। সুতরাং ষাটের দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলে গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থাবলীই 'স্বাধীন' দেশে অন্যান্য খাতের মতো কৃষি খাতকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

১৯৬০ দশকের মধ্যভাগে বিশ্বব্যাংক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর (বিশেষত কৃষি) এক ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়েছিল। বিশ্বব্যাংক প্রণীত সেই ৯ খণ্ড সমীক্ষাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কৃষিনীতির মূল কাঠামো তৈরি করেছে। সমীক্ষাটি স্বাধীনতার পরপরই প্রকাশিত হয় এবং নতুন সরকারের জন্য সেটাই ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করতে থাকে। সমীক্ষায় কৃষি এবং পানিসম্পদ বিষয়ে সরকারের জন্য বিশ্বব্যাংকীয় দর্শন অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা ছিল। কিন্তু রিপোর্টগুলোর উপর 'গোপনীয়' সিল মেরে ওগুলো জনগণের অগোচরে রেখে দেয়া হয়। জনগণ পায় এর ফলাফল।

যাঁরা প্রচলিত দারিদ্র্যসীমার একটু উপরে আছেন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁদের সামাজিক অবস্থানে পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ যথেষ্ট খাদ্য ও যথাযথ পুষ্টিমানসহ 'খাদ্য নিরাপত্তা'র সামগ্রিক শর্তাবলি বিবেচনায় দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণের দক্ষতা অর্জনের নামে এই একরৈখিক নীতিমালা যেসব কাজ করার জন্য প্রণীত হয়েছে তার মূল দিকগুলো হলো : ১. সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় উপেক্ষা করে বাজার ও মুনাফামুখী কৃষি উৎপাদনকে সর্বাত্মক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান। ২. বাংলাদেশের খাদ্য অর্থনীতিকে বহুজাতিক পুঁজির সাথে যুক্ত করা। ৩. উচ্চফলনশীল বীজ (উফশী), সার, কীটনাশক জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রথমে বিপুল ভর্তুকি দিয়ে এগুলোর বিতরণ এবং পরে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি হ্রাস। ৪. নতুন প্রযুক্তি বিতরণ যথাযথভাবে করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রথমে ব্যবহার, পরে এগুলোর উপর কৃষকদের নির্ভরশীলতা তৈরির পর অপচয়মূলক ঘোষণা করে তার সংকোচন। ৫. গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক পুঁজির কর্তৃত্বাধীন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। ৬. কৃষি উপকরণ ক্রমান্বয়ে বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়া। ৭. খাদ্যদ্রব্য আমদানি উন্মুক্ত করা। ৮. রেশনিং ব্যবস্থা বাতিল করা।

প্রথম দিকে কৃষকরা কীটনাশক, রাসায়নিক সার, উফশী বীজ এবং যান্ত্রিক সেচ গ্রহণ করতে চাননি। ৬০ দশকের সরকারি রিপোর্টেও এই তথ্য স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রচার, ভর্তুকি ও আশু লাভের সম্ভাবনা ক্রমে এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। কৃষকরা যখন এগুলো গ্রহণ করবার পর ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করতে থাকেন, তখন থেকেই দক্ষতা ও বাজার শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আনতে থাকে বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড ও তাদের কনসালট্যান্টরা। আর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কীটনাশক, রাসায়নিক সার, উফশী বীজ এবং শ্যালো ও ডিপ টিউবওয়েল বাণিজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে।

১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত কীটনাশক বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হতো। যখন চাষিরা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথমে যুক্তি দেয়া হয় এই বলে যে, 'অপচয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার আগামী বছরের শুরুতে ন্যূনতম মূল্য ধার্য করার পরিকল্পনা নিচ্ছে'। এক বছরের মাথায় সরকার ইউরিয়া সারের মূল্য ১০০ শতাংশ এবং ফসফেট ও পটাশ সারের মূল্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। সেই ধারাই অব্যাহত আছে।

ক্রমে কীটনাশক, রাসায়নিক সার এবং শ্যালো ও ডিপ টিউবওয়েল সবকিছুরই চাহিদা বাড়ে, ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, দামও বাড়ে সবগুলোরই। এগুলো নিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দুই পর্যায়েই বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দাপটে এই ক্ষেত্রও ক্রমে রাষ্ট্রের হাত থেকে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। যে রাসায়নিক সার কৃষকরা একসময় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই সার নিয়েই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সংকট তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালে সার সংকটের সময়, সার সংগ্রহ করতে এসে কৃষকরা তা পেতে ব্যর্থ হন, উদ্ভ্রান্ত উত্তেজিত

উৎপাদকদের উপর পুলিশ গুলিও চালায়। সে বছর সার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৭ জন কৃষক।

বহুজাতিক বাণিজ্যে কৃষি ও খাদ্য

এভাবেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার সমস্যা কিংবা সরকারি কৃষিনীতি, বৈশ্বিক পর্যায়ে কৃষি ও খাদ্য খাতে বহুজাতিক পুঁজির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে। কৃষি ও খাদ্য, বিশ্ব বাণিজ্যের এক বড় ক্ষেত্রে পরিণত হয় ষাটের দশক থেকেই। 'সবুজ বিপ্লব' এই বাণিজ্য বৈশ্বিকীকরণ ও বিস্তৃতিকরণের অন্যতম অবলম্বন ছিল। ষাটের দশকে যে কৃষি রাসায়নিক বাজারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সেটি এখন কমপক্ষে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশ্ব বাণিজ্য।

এই বাণিজ্যে নিয়োজিত বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে একীভূত হয়ে অধিকতর বৃহদাকার লাভ করছে এবং বাজার অধিকতর একচেটিয়াকৃত হচ্ছে। যেমন–সিবা ও স্যানডোজ মিলে নোভার্টিস আবার জেনেসের সঙ্গে মিলে সিনজেন্টা। হোয়েকস্ট ও শিরিং মিলে এগ্রেভো এবং রোন পোলাংকের সঙ্গে মিলে গঠন করেছে এভেনটিস। কৃষি বাণিজ্যে সিনজেন্টা ও মনসান্টোই এখন শীর্ষে।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের বীজ বাণিজ্যের শতকরা ৬৭ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের ১০টি বৃহৎ কোম্পানি। এগুলোর শীর্ষে আছে মনসান্টো (যুক্তরাষ্ট্র), এরপর যথাক্রমে আছে ডুপন্ট (যুক্তরাষ্ট্র), সিনজেন্টা (সুইজারল্যান্ড), গ্রুপ লিমাগ্রেইন (ফ্রান্স), ল্যান্ড ও লেকস (যুক্তরাষ্ট্র), কেডাব্লিউএজি (জার্মানি), বায়ের ক্রপ সাইন্স (জার্মানি), সাকাতা (জাপান), ডিএলএফ (ডেনমার্ক), তাকি (জাপান)। প্রথম দুটি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিই নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ব বীজ বাণিজ্যের শতকরা ৩৮ ভাগ। সিনজেন্টাসহ এই তিনটি কোম্পানি প্রায় অর্ধেক বীজ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক। এসব সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু প্রায়শই তাদের নিজেদের কার্টেল তৈরি হয়। যেমন–গত কয় বছরে মনসান্টো ও সিনজেন্টা বা ডুপন্ট ও সিনজেন্টা সমঝোতা করে নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থ নিশ্চিত করেছে। এ রকম ঘটলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বীজের সংকট, কৃষক নিয়ন্ত্রিত বীজের বিপর্যয়, খাদ্য সংকট–সবই এসব সংস্থার জন্য সুখবর। কেননা তাতে বাজারের বিস্তৃতি ও মুনাফার বৃদ্ধি সহজ হয়।

কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিশেষত কীটনাশক ওষুধের ক্ষেত্রে বিশ্ব উৎপাদন ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ ১০টি কোম্পানি। এর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে আছে বেয়ার (জার্মানি) : ১৯ ভাগ ও সিনজেন্টা (সুইজারল্যান্ড) : ১৯ ভাগ। এরপর যথাক্রমে আছে বিএএসএফ (জার্মানি), ডো এগ্রো সাইন্সেস (যুক্তরাষ্ট্র), মনসান্টো (যুক্তরাষ্ট্র), ডুপন্ট (যুক্তরাষ্ট্র), মাখতাশিম আগান (ইসরায়েল), নুফার্ম (অস্ট্রেলিয়া), সুমিতোমো কেমিক্যাল (জাপান), আরিস্টা লাইফ সাইন্স (জাপান)। এদের বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ এখন ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছেই। এর বৃহৎ অংশই গেছে গরিব দেশগুলোতে। অন্যদিকে সারের দামও বেড়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে যা ছিল টনপ্রতি ২৪৫ মার্কিন ডলার, আগস্ট ২০০৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৬০০ মার্কিন ডলারে। নির্দিষ্টভাবে একই সময়কালে ফসফেটের দাম বাড়ে ৭ গুণ। সার বাণিজ্যে বৃহৎ কোম্পানিগুলো হলো পটাশকর্প (কানাডা), ইয়ারা (নরওয়ে), মোজাইক-কারগিল (যুক্তরাষ্ট্র), ইসরায়েল কেমিক্যালস (ইসরায়েল), এগ্রিয়াম (কানাডা), কে+এস গ্রুপ (জার্মানি)।

এসব 'উন্নয়ন' সামগ্রী ব্যবহারে সামাজিক, পরিবেশগত ও উৎপাদনে ক্ষতি নিয়ে বিস্তৃত কোনো সমীক্ষা পাওয়া কঠিন। আংশিক সমীক্ষায় দেখা যায়, এসব সামগ্রীর প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উপকূলীয় ৪০০টি মৃত্যু-অঞ্চল তৈরি হয়েছে, যার মোট এলাকার আয়তন ২,৪৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। স্বাধীন বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, গত ৫০ বছরে বাজারমুখী উৎপাদন বৃদ্ধির উন্মাদনায় রাসায়নিক সার, সেচ, কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ জমির উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় খর্ব হয়েছে। এসব কারণে স্বাদু পানির স্বাভাবিক মাছ উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধিও এর একটি ফলাফল। যান্ত্রিক সেচের আওতায় বিশ্বের যত জমি আছে তার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এখন লবণাক্ততার শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এবং এর বাইরেও কমপক্ষে ৩০ লাখ মানুষ কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়, এবং কমপক্ষে ২ লাখ মানুষ এর কারণে মৃত্যুবরণ করে। ভারতে লাখো কৃষকের আত্মহত্যা এই বাণিজ্য আধিপত্যেরই ফল।

ষাটের দশক থেকে ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের নামে বহুজাতিক সংস্থাসমূহ খাদ্য আবাদের জমিতে রপ্তানিমুখী প্লান্টেশন করেছে; কোকো, কফি, কলার রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক উৎপাদনেই তাদের প্রধান আগ্রহ। এতে খাদ্য উৎপাদন কমেছে, ফলে এসব অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি বেড়েছে। বেড়েছে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা। আফগানিস্তান থেকে এখন বিশ্ব চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ হেরোইন সরবরাহ হয়, শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ সেখানে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। কলম্বিয়ায় কফি উৎপাদন হচ্ছে শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ আবাদি জমিতে। সেখানে দারিদ্র্য, সামরিকীকরণ, সহিংসা পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র দেশগুলোতে ভর্তুকি দিয়ে বাজার ঠিক রাখার জন্য জমি পতিত রাখা, দুধ সমুদ্রে ফেলে দেয়ার ঘটনা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্যদিকে বিভিন্ন দুর্বল দেশে খাদ্য সংকটের সুযোগে, পিএল ৪৮০-এর অধীনে খাদ্য 'সাহায্য' সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের একটি অস্ত্র হিসেবে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। বহুজাতিক পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী, কৃষি ও খাদ্যের বাণিজ্যিকীকরণ ও ক্রমবর্ধমান মুনাফা নিশ্চিত করতে গিয়ে একদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা নষ্ট করে দীর্ঘ মেয়াদে তা খাদ্য উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা অনিশ্চিত ও নাজুক করে তুলেছে। পাশাপাশি পুঁজিমুখী বিভিন্ন নীতি, সংস্কার ও চুক্তি কৃষি ও খাদ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার কর্তৃত্ব বিশাল জনগোষ্ঠী এবং দুর্বল দেশগুলোর হাত থেকে কতিপয় কোম্পানির হাতে স্থানান্তর করেছে। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এসব তৎপরতায় বহু দেশে খাদ্যনীতি, পরিকল্পনা, গবেষণা, উৎপাদন, সেচ, বীজ, বিতরণ ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থাসহ দেশি-বিদেশি মুনাফাকেন্দ্রিক তৎপরতার অধীনস্থ হয়ে গেছে। জনগণের ক্ষুধা, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন এবং তা জনগণের কাছে সুলভ করার পথে এখন প্রধান প্রতিবন্ধক হলো এই

মুনাফাকেন্দ্রিক নীতি ও তৎপরতা। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা এরই সহযোগী।

খাদ্যের আকর্ষণীয় প্যাকেজ ও বিষ

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন এখন প্রায় পুরোপুরি রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং যান্ত্রিক সেচনির্ভর। ধান-চাল, ফল, সবজি, মাছ, ডিম, মুরগি–সবকিছুরই উৎপাদন বেড়েছে, আকর্ষণীয় চেহারায় সেগুলো বাজারে উপস্থিত হচ্ছে; কিন্তু এর প্রায় সবই বিষ বহনকারী। নকল বিষাক্ত রং এবং ভেজাল কারখানা এখন বিনিয়োগের বড় ক্ষেত্রও বটে। আমদানিকৃত খাবারের অনুপাত বেড়েছে এবং সেগুলোর মান রক্ষার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। সুপারমার্কেট, দামি রেস্তোরাঁগুলো ভালো বাণিজ্য ক্ষেত্র, কিন্তু খাদ্যের দিক থেকে ভোক্তাদের জন্য বিপজ্জনক।

উফশী বীজের পরবর্তী পর্যায়ে এখন বাংলাদেশে হাইব্রিড বীজ চালু হচ্ছে, জিএম নিয়েও আয়োজন চলছে। সম্প্রতি বিটি বেগুন চালু করতে কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে কৃষিমন্ত্রী কয়েকটি অঞ্চলে বিটি বেগুনের চারা বিতরণ করেন। বহু দেশে এই ধরনের বীজ নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে মন্ত্রণালয় কারো কোনো যুক্তি বা সতর্কবাণীতে কান দেয়নি। গত ৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে বিটি বেগুন নামের জিএম বীজে উৎপাদনের সাফল্য বর্ণনা করতে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেছিল। সেখানে যে কৃষকদের জড়ো করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কথা বলেছেন খুবই কম। যতজন বলেছেন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠই জানিয়েছেন, এই বিটি বেগুন তাঁদের গছিয়ে দেয়া হয়েছিল উচ্চ ফলনের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে তাঁদের সর্বনাশ হয়েছে। তাঁরা বরং এর জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন।

১৯৯৯ সালে গৃহীত বাংলাদেশে কৃষিনীতিতে প্রধান উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে 'জৈব প্রযুক্তির প্রবর্তন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ'কে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বীজ নিয়ে গত কয়েক বছরে অনেকগুলো বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে, যার আংশিক মাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধানবীজের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ফসল উৎপাদনের উচ্চহারের লোভ দেখিয়ে বীজ বিক্রি করা হয়েছে, কিন্তু কৃষকদের পুরো মাঠের ফসল যখন এই বীজের কারণে মার খেয়েছে, তখন এর দায়-দায়িত্ব কেউ নেয়নি–না সরকার, না কোম্পানি। অথচ কোনো বিচার বা ফলাফল পর্যালোচনা না করে জিএম খাদ্য প্রচলন ও হাইব্রিড বীজের উপর কৃষি ও কৃষককে নির্ভরশীল করে তোলার সর্বব্যাপী কার্যক্রমে ব্যাপক উৎসাহ এবং সংঘবদ্ধ তৎপরতা চলছে।

এই কাজে বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, দেশি গবেষণা সংস্থা, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও, দেশীয় কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ভূমিকা ঐক্যবদ্ধ।

জিএম খাদ্য ও হাইব্রিড বীজ বর্তমান বিশ্ব পরিসরে কৃষি ও খাদ্য বাণিজ্যের অন্যতম ক্ষেত্র। বিভিন্ন দুর্বল দেশ এর প্রধান টার্গেট। বিভিন্ন দেশে এর ভয়াবহতা প্রমাণিত, বিশ্বব্যাপী এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিস্তার লাভ করলেও মুনাফাকেন্দ্রিক তৎপরতায়

একদিকে খাদ্য নিয়ে বিলাসিতা, অন্যদিকে ন্যূনতম খাদ্যের জন্য হাহাকার; একদিকে পানির অপরিমিত ব্যবহার, পানির যথেচ্ছাচার দূষণ, অন্যদিকে ন্যূনতম পানির জন্য কোটি কোটি মানুষের মরণদশা–এই বৈপরীত্যই বর্তমান বিশ্বের চিত্র।

নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশে এটি চালু করার চেষ্টা চলছে। প্রায় এক দশক আগে সরকার এই বীজ আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। ভিটামিন এ যুক্ত, কীটপতঙ্গরোধক, গরিবদের পুষ্টিবর্ধক ইত্যাদি প্রচারণার অস্ত্র দিয়ে জিএম বীজের আধিপত্য নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। কোম্পানি কর্তৃক কৃষকদের বীজ বাজার দখলের আয়োজন এখন অনেকখানি সফল। বিজ্ঞাপন শক্তির কারণে কোক, পেপসিসহ নানা ক্ষতিকর তথাকথিত শক্তি পানীয় নিয়ে মিডিয়া কোনো সত্য উচ্চারণেও অনাগ্রহী। ভারতে একদল বিজ্ঞানী কোক-পেপসির মধ্যে বিষাক্ত উপাদান আবিষ্কার করার পর কোথাও কোথাও তার বিক্রি হ্রাস হলেও বিজ্ঞাপনের জোরে নিজের প্রতাপ এখনো অক্ষুণ্ন রেখেছে। বাংলাদেশে এগুলোর সাথে যোগ হয়েছে বহুবিধ নতুন দেশি-বিদেশি তথাকথিত 'শক্তিবর্ধক' পানীয়। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলো এগুলোর প্রধান প্রচারমাধ্যম।

গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, কীটনাশক, রাসায়নিক সার ও যান্ত্রিক সেচের প্রসার প্রাথমিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও এর বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য হ্রাস করেছে। বাজারবান্ধব খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশীয় প্রকৃতিবান্ধব বীজ হারিয়ে যাচ্ছে, খাল-বিল-নদীর মৎস্য প্রাপ্তিতে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ভূগর্ভস্থ পানি নির্বিচারে ক্রমাগত টেনে তোলায় ভূগর্ভে ভারসাম্য অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর এক মহাবিপর্যয়কারী ফলাফল হলো আর্সেনিক। বহু বছর যে টিউবওয়েলকে নিরাপদ পানির উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, এবং দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ জন মানুষ নিরাপদ পানি পান করছে, সেই টিউবওয়েলগুলোর একটি বড় অংশ এখন আর্সেনিকযুক্ত পানির প্রবাহের মাধ্যম। বাংলাদেশের সাড়ে ৩ কোটি মানুষ এখন আর্সেনিক বিষের হুমকির মুখে।

রাসায়নিক সার, কীটনাশক সারের ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধি ভূ-উপরিস্থিত পানিও বিষাক্ত করে ফেলেছে। মাছের স্বাভাবিক উৎপাদন এতে ব্যাহত হচ্ছে, পানির ভেতরে প্রাণবৈচিত্র্যও বিনষ্ট হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত দুই ক্ষেত্রেই পানি যখন বাণিজ্যমুখী 'উন্নয়ন' নীতির কারণে বিষাক্ত, তখন আরেকটি বাণিজ্য ক্ষেত্র এখন সম্প্রসারণশীল। সেটি হলো বোতল পানি। পানি এখন কিনে খেতে হয়, সেই পানিও যে নিরাপদ নয় তা বহুভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত এবং বিস্তৃতভাবে বাণিজ্যিক তৎপরতার অধীনস্থ হচ্ছে পানের পানি।

পানির বাণিজ্যিকীকরণ

'রাজা ছাড়া মানুষ বাঁচে
মানুষ ছাড়া রাজ্য বাঁচে না।
পশু ছাড়া ঘাস বাঁচে
ঘাস ছাড়া পশু বাঁচে না।
প্রাণ ছাড়া পানি বাঁচে
পানি ছাড়া প্রাণ বাঁচে না।'
–নাইজেরীয় লোককবি

আমাদের পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগই পানি। আমাদের শরীরের পানির অনুপাতও এ রকমই। এই পানি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও আমরা দেখছি, পানি ক্রমেই একটি দুর্লভ ও ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত হচ্ছে। একদিকে খাদ্য নিয়ে বিলাসিতা, অন্যদিকে

ন্যূনতম খাদ্যের জন্য হাহাকার; একদিকে পানির অপরিমিত ব্যবহার, পানির যথেচ্ছাচার দূষণ, অন্যদিকে ন্যূনতম পানির জন্য কোটি কোটি মানুষের মরণদশা–এই বৈপরীত্যই বর্তমান বিশ্বের চিত্র। পানির সংকট ও বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন খাদ্য নিরাপত্তার বর্তমান সংকটের প্রসঙ্গে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

বেঁচে থাকার জন্য পানি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। শুধু পান করার জন্যই নয়, জগৎ টিকিয়ে রাখার জন্য, অন্য সকল খাদ্য উৎপাদনের জন্যও পানি অপরিহার্য। এই অপরিহার্যতাই পানির দিকে কোম্পানির মুনাফার আকর্ষণ তৈরি করেছে। আর তাতে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বিপদ বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পানি প্রকৃতির অংশ, এটা কেউ তৈরি করেনি। এটি সর্বজনের। প্রয়োজনীয় পানি সবার জন্মগত অধিকার। এই পানি কেন কোম্পানির মালিকানায় যাবে? পানি কেন পণ্যে পরিণত হবে? কেন পানি কিনে খেতে হবে?

পৃথিবীর যত পানি তার শতকরা প্রায় ৯৭.৫ ভাগই সমুদ্রে, অতএব নোনা। এই পানি ধারণ করে আছে জানা-অজানা অনেক সম্পদ। বাকি শতকরা ২.৫ ভাগের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি জমে আছে বরফ হয়ে, যা জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। বাকি পানির তিন-চতুর্থাংশই ভূগর্ভস্থ পানি, যা এই পৃথিবীকে শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি, তাকে অবিরাম সৃজনশীল রেখেছে। বাকি অর্থাৎ শতকরা মাত্র ০.৩ ভাগ পানি আছে নদী, খাল-বিল, জলাশয় ইত্যাদিতে। অতএব, সব মিলিয়ে পৃথিবীর মোট পানির শতকরা ১ ভাগেরও কম পানযোগ্য। বাংলাদেশে বিপুল সুপেয় পানির আধারের মধ্যে বাস করে এটা কল্পনা করাও কঠিন যে, পৃথিবীর বহু দেশ এই পানযোগ্য পানিরই ভয়াবহ সংকটের মধ্যে বাস করে। কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে খাবার পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। একেকজনকে দিনে অন্তত ৫ ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় করতে হয়। আর এই কাজ করতে হয় মেয়েদেরই। প্রতিদিন ভারী পাত্র নিয়ে পানির জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটার দৃশ্য পৃথিবীর বহু দেশে খুব পরিচিত।

ভারত-পাকিস্তানেও বহু অঞ্চল আছে, যেখানে একটি জলাশয় বা একটি কূপ থেকে পানি সংগ্রহের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে, এর কোনো বিকল্প নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অধিকাংশ এলাকায়ও খাবার পানির সংকট প্রকট। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ দূর করে সুপেয় পানির জোগান দিচ্ছে। বর্তমানে প্রধানত পারস্য উপসাগর তীরবর্তী দেশগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার ডিস্যালিনাইজেশন প্লান্ট থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি গ্যালন সুপেয় পানি জোগান দেয়া হচ্ছে।

সুপেয় পানির যখন এ রকম সংকট, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে উন্নয়ন নামের আগ্রাসী তৎপরতার কারণে। আগেই বলেছি, 'সবুজ বিপ্লব' নামাঙ্কিত কৃষি যান্ত্রিক সেচের মাধ্যমে বিপুল পানির চাহিদা তৈরির মাধ্যমে একদিকে ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহার ভূ-উপরিস্থিত পানি দূষিত করছে। এছাড়াও আছে ভবন বাণিজ্যের সম্প্রসারণে নদী, খাল-বিল, জলাশয় ভরাট করার অপ্রতিরোধ্য যাত্রা। ইটের ভাটা, শিল্পবর্জ্য তো আছেই। এর পাশাপাশি আছে সেচ কার্যক্রম সম্পসারণ, কোথাও বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে, কোথাও সড়ক পরিবহনের সুবিধার জন্য বাছবিচারহীনভাবে বাঁধ-কালভার্ট নির্মাণ। এগুলোর ফলে কোথাও নদীর অবাধ প্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও পানির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে পানি, মাটি, অতঃপর মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে।

শুধু দেশের ভেতর নয়, ভারতে নির্মিত বাঁধ এবং পানি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাও বাংলাদেশের জন্য হুমকি। ফারাক্কা বাঁধ গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন, নদীর প্রবাহ, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা, জীববৈচিত্র্য–সবকিছুরই অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলও এখন এর জন্য ক্ষতির শিকার। এর উপর আবার টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে পরিকল্পনা চলছে। সম্প্রতি চীনও ব্রহ্মপুত্র নিয়ে যে বাঁধ পরিকল্পনা করছে তা বাস্তবায়িত হলে ভারত-বাংলাদেশ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারাবিশ্বেই বাঁধ একটি বড় বাণিজ্যিক তৎপরতা। শুধু বাঁধের কারণে বিশ্বব্যাপী কমপক্ষে ৮ কোটি মানুষ এখন উদ্বাস্তু।

বিশ্বব্যাপী পানি দূষণের একটি বড় কারণ যুদ্ধাস্ত্র গবেষণা ও তার ব্যবহার। সমুদ্র, মহাকাশসহ বিভিন্ন স্থানে পারমাণবিক, রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র গবেষণা বা প্রয়োগ করতে গিয়ে কিংবা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূগর্ভ পর্যন্ত সবই বিপজ্জনক মাত্রায় দূষণের শিকার হচ্ছে। জাপানের ফুকুশিমায় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনায়ই বায়ু, পানি, খাদ্য–সবকিছুর উপর যে ভয়াবহ প্রভাবের খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বিশ্বব্যাপী এগুলোর সম্ভাব্য বিপদ কল্পনা করাও কঠিন। বিষাক্ত অস্ত্রের সার্বক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল কী হচ্ছে তার বেশিরভাগই আমাদের অজানা। কেননা যারা এসবের জন্য দায়ী, প্রচারযন্ত্রের উপরও তাদেরই নিয়ন্ত্রণ। কারণ পরিষ্কারভাবে না জানলেও শিকার বিশ্বের মানুষই।

'উন্নয়ন' নাম দিয়ে মুনাফা উন্মাদনায় পানি একদিকে দূষণ ও অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে সৃষ্ট সংকটের সুযোগ নিয়ে মানুষের পানি দখলে নিচ্ছে কোম্পানি। ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকেই উন্নয়নের নামে জগতের বাকি সবকিছু ব্যক্তিমালিকানা, বাণিজ্য আর মুনাফার কর্তৃত্বে আনার উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। সড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন শুধু নয়, ক্রমে পানিও এই আগ্রাসনের অধীনস্থ হয়। এই কাজে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পানির বাণিজ্যিকীকরণে সবচাইতে অগ্রণী। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এডিবির ভূমিকা আরও বেশি সক্রিয়।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকে যত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানার বাণিজ্যিক তৎপরতার আওতায় আনা হয়েছিল তার ৮৪ ভাগ ২০০৭ পর্যন্ত টিকে আছে, যদিও ২৪টি দেশ পানি ব্যবস্থার আবারও রাষ্ট্রীয়করণ করেছে। বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে নেয়া ঋণের শর্ত অনুযায়ী বলিভিয়া নব্বইয়ের দশকের শেষেই পানি বাণিজ্যিকীকরণ করার নীতি গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক মার্কিন কোম্পানি বেখটেল বলিভিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর কোচাবাম্বার সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। এমনকি বৃষ্টির পানিও তাদের কর্তৃত্বাধীন করা হয়। পানির দাম পরিশোধে ব্যর্থ হলে নাগরিকদের ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত করারও অধিকার দেয়া হয় এই মার্কিন কোম্পানিকে। বলিভিয়ার গ্যাস নিয়েও এ রকম চুক্তি করা হয়।

রাস্তায় প্রতিরোধ তৈরি করা ছাড়া তখন বলিভিয়ার জনগণের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। তারা তা-ই করেছে। ক্রমে

পানি ও গ্যাসসম্পদ রক্ষার আন্দোলন বলিভিয়ায় বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর মধ্য দিয়ে পানির উপর বলিভিয়ার সকল নাগরিকের অধিকার, গ্যাসসম্পদের উপর জনগণের মালিকানা এখন স্বীকৃত। জনগণের বিজয়ের মুখে কোণঠাসা কোম্পানি বেখটেল তার সম্ভাব্য মুনাফার অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)-এ মামলা করেছিল। তাদের দাবীকৃত অর্থ ছিল বলিভিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শতকরা ১.৭ ভাগ সমপরিমাণ। বিশ্বব্যাংক এই শুনানি প্রকাশ্যে করার সব দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ ঋণ জালের বিশেষ শর্ত হিসেবে পানি ব্যক্তিমালিকানায় বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে রূপান্তরের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে। দিনে দিনে এগুলোর চাপ আরো বেড়েছে, কারণ পানি বাণিজ্যের উচ্চ মুনাফার সম্ভাবনা এই খাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি করে। পানি বাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। এখন বিশ্বের তিনটি বৃহৎ পানি বহুজাতিক কোম্পানি হলো সুয়েজ, ভিওলিয়া ভিভেন্দি এবং আরডব্লিউই। কোক-পেপসি, যারা খাবার পানি দখল করে পানীয় বাণিজ্য করছে, তারাও এখন পানি বাণিজ্যে প্রবেশ করেছে। জার্মান কয়লা কোম্পানি আরডব্লিউই, যাদের মুনাফা বাড়াতে পানিসম্পদ বিনষ্ট হয়, তারাও এখন পানি বাণিজ্য শুরু করেছে।

বিভিন্ন সমীক্ষার সূত্রে 'The Water Business' গ্রন্থ দেখাচ্ছে যে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পানির উপর সুয়েজ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পরই পানিদূষণ বৃদ্ধি পায়। কানাডার অন্টারিওতে পানিদূষণে কমপক্ষে সাতজন মৃত্যুবরণ করে, কেননা তাদের প্লান্ট ও টেস্ট প্রক্রিয়া তারা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি হিসেবে গোপন রেখেছিল। মরক্কোর মানুষ কাসাব্লাঙ্কায় পানির দাম তিনগুণ বৃদ্ধির মধ্যেই বাণিজ্যিকীকরণের মর্ম বুঝতে পেরেছিল। আর্জেন্টিনার পানির কর্তৃত্বও পেয়েছিল সুয়েজ। এর ফলে পানির দাম দ্বিগুণ হয়েছিল, কিন্তু এর গুণগত মানের অবনতি হয়েছিল। মানুষের প্রতিবাদে, বিল পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোয় পরে কোম্পানি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। একই কারণে ব্রিটেনেও পানির দাম বেড়ে যায়। পানির বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে নিউজিল্যান্ডের মানুষকেও রাস্তায় নামতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও পানি বাণিজ্যিকীকরণে সুয়েজ কর্তৃত্ব পেয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পানি এমন বিষাক্ত হয়েছিল যে, কলেরা মহামারির আকার নেয়ায় পানি সংযোগ অনেকদিন বিচ্ছিন্ন থাকে। ইরাক ধ্বংসযজ্ঞের পর বেখটেল ও এসব কোম্পানির জন্য সোনায় সোহাগা হয়। এখন আর বিশুদ্ধ পানি পান ইরাকের মানুষের জন্য সহজ নয়। জীবন, পানি, শিক্ষা, চিকিৎসা–সবই এখন আগ্রাসী দখলদারদের কবলে। ঘানা ও উরুগুয়েও এই পথে গিয়েছিল, পরে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জনবিক্ষোভ তৈরি হয়। ২০০৪ সালে গণভোটের মাধ্যমে এ দুই দেশে পানির ব্যক্তি বাণিজ্যিকীকরণ নিষিদ্ধ হয়। নেদারল্যান্ডসও একই বছর গণপানি সরবরাহ ব্যক্তিকরণ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে।

আর বিপুল আধারের মধ্যে থেকেও বাংলাদেশের মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত। যত দিন যাচ্ছে তত পানিদূষণ বাড়ছে, বোতল পানির বাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে পানি সরবরাহের মূল ব্যবস্থাও নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার আয়োজন চলছে। ভিওলিয়া, সুয়েজসহ দেশি-বিদেশি পানি বণিকরা এখন নানাভাবে বাংলাদেশে হাজির হচ্ছে। ভিওলিয়ার কাজ শুরু হয়েছে 'গরিবের ব্যাংক' নামে প্রচারিত গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে।

খাদ্য সংকটের সুবিধাভোগী : দুর্বৃত্ত বিশ্বজোট

'এর আগে আর কখনো কৃষকেরা এই ধরিত্রী থেকে এত বেশি খাদ্য বের করতে পারেনি। ফসলের এত প্রাচুর্যও এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি।'

২০০৮ সালে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোলিক নিজেই বললেন, '২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে শতকরা ৮০ ভাগ। গত মাসে চালের দাম গত ১৯ বছরের মধ্যে এবং গমের দাম ২৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।' এই দাম হলো এর আগের ২৫ বছরের গড় দামের দ্বিগুণ। তিনি তখন আরো বলেছেন, 'খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে ৩৩টি দেশে ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।' দিচ্ছে, আরো দেবে তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তিনি ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য মহাসংকটের আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছিলেন। (http://www.reuters.com/article/2008/04/02/us-worldbank-zoellick-food-idUSNYC00009520080402)

কিন্তু এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণগুলো তাঁর মুখে আসেনি, আসার কথাও নয়। কেননা তিনি পদাধিকার বলে এর জন্য দায়ী দুর্বৃত্ত বিশ্বজোটেরই অংশ। কারণ হিসেবে তিনি যে দুটো বিষয় তখন বলেছেন সেগুলোই তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে বলা হয়েছে সারাক্ষণ। এর একটি হলো 'খারাপ আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন হ্রাস', আরেকটি 'ভারত, চীনসহ উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধি'। আমাদের দেশের মন্ত্রীরাও তখন বার বার বলেছেন, দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি উন্নয়নের লক্ষণ!

প্রকৃতপক্ষে প্রচারণার উন্মাদনায় যে সত্যটি আড়াল করা হয়েছে সেটা হলো, মানুষের কৃষি উৎপাদনের ইতিহাসে সবচাইতে প্রাচুর্যময় বছর ছিল এই ২০০৮ সাল, যখন মূল্যবৃদ্ধিও সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এই বছরই বিশ্বে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। Empires of Food-এর লেখকদের ভাষায়, 'এর আগে আর কখনো কৃষকরা এই ধরিত্রী থেকে এত বেশি খাদ্য বের করতে পারেনি। ফসলের এত প্রাচুর্যও এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি।' এর পরিমাণ ছিল ২২৪ কোটি টন, যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ বেশি।

মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কারণ সম্পর্কে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা হচ্ছে, চাহিদার তুলনায় জোগানের ঘাটতি। এই ধারণার পেছনে সত্য আছে। কিন্তু ২০০৮ সালের উৎপাদনের তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এটি প্রধান কারণ নয়। কিন্তু জোগানের ঘাটতি সৃষ্টির হুমকি জারি আছে। এই হুমকি বা সম্ভাবনা থাকলে অনেকের লাভ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ল্যাটিন আমেরিকা প্রধান যথার্থই বলেছেন, 'The crisis is a speculative attack and it will last....Speculative attacks become possible when you have low reserves'। এখান থেকে বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্যের মজুদ কম রাখার বিশ্বব্যাংকীয় নীতি ব্যাখ্যা করা যায়।

বিশ্বব্যাংকীয় দর্শন এবং কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় খাদ্যগুদামকে 'অপচয়' হিসেবে অভিহিত করে নব্বইয়ের দশক থেকে অভ্যন্তরীণ মজুদ বা সংরক্ষণ কমিয়ে ফেলার নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বাজারের স্বাধীনতার নামে, অভ্যন্তরীণ জোগানে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুযোগ তুলে দেয়া হয়েছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে। তাঁরা সেই সুযোগ ভালোমতোই গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রয়োজনমতো সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট।

দ্বিতীয়ত, চাহিদা বৃদ্ধি খাদ্য সংকটের একটি বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধি তো হুট করে এক বছরে হয় না। পশ্চিমা বিশ্বে এবং প্রান্তস্থ দেশে জনগোষ্ঠীর একাংশের অপচয়মূলক অতিভোগ বর্ধিত চাহিদার একটি বিশেষ দিক। আর সাধারণভাবে জোগানের হুমকি সৃষ্টির প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নয়, বরং নির্বিচার মুনাফামুখী তৎপরতায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়া বা তার সম্ভাবনাই এর প্রধান কারণ। শিল্পোন্নত বিশ্বে জৈব জ্বালানির জন্য কৃষিজমির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদনের জমি কমেছে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ২০ ভাগ জমি ইথানল উৎপাদনের জন্য ভুট্টা চাষে ব্যবহৃত হয়। ব্রাজিল তার উৎপাদিত আখের শতকরা ৫০ ভাগ জৈব জ্বালানিতে ব্যবহার করছে।

প্রতিবছর সারাবিশ্বেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কৃষিজমি হয় অকৃষি খাতে অথবা অধিক মুনাফাযোগ্য কিন্তু কম প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য উৎপাদনে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ হেক্টর জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। এর বড় অংশ ভবন, বাজার, সড়কসহ নানা ধরনের নির্মাণ ও 'উন্নয়ন' প্রকল্পের কারণে। এছাড়া ভুল প্রকল্পে ও দুর্নীতিযুক্ত তৎপরতায় স্বাদু পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিও অনেক জমি নষ্ট করছে। বাংলাদেশের মানুষ জীবন দিয়ে 'উন্মুক্ত খনি'র 'উন্নয়ন' প্রকল্প প্রতিরোধ করেছে। এর ফলে উন্নয়নের নামে মরুকরণ, আবাদি জমি ও পানিসম্পদ নষ্ট এবং সর্বোপরি জ্বালানি সম্পদ পাচারের যে অচিন্তনীয় বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল, তার থেকে রক্ষা পেয়েছে দেশ। মানুষ আড়িয়ল বিল ধ্বংস করে বিমানবন্দর নির্মাণের প্রকল্পও ঠেকিয়েছে। এর ফলেও খাদ্য নিরাপত্তার আরেক বিপদ থেকে তারা দেশকে রক্ষা করেছে। কিন্তু দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর বিপুল মুনাফার সুযোগ থাকায় এসব চক্রান্ত এখনো চলছে।

তৃতীয়ত, মূল্যবৃদ্ধির আরেকটি বড় কিন্তু অনুচ্চারিত কারণ হলো উৎপাদিত খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই ফাটকা পুঁজির দানবীয় তৎপরতার খোরাক হওয়া। এগুলো বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে গৃহীত নীতিকাঠামোরই ফল, যার অন্যতম অংশীদার বিশ্বব্যাংক।

জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মুনাফাকেন্দ্রিক উন্নয়নকৌশল একসাথে চলতে পারে না। গত এক দশকে খাদ্য নিয়ে ফাটকা পুঁজির নিয়ন্ত্রণহীন তৎপরতা কতিপয়ের জন্য দ্রুত মুনাফা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিলেও জনগণের জন্য খাদ্য পরিস্থিতি আরো নাজুক করেছে। গত কয়েক বছরে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনে এর ভূমিকাই সবচাইতে বেশি।

৭৫ বছর ধরে US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) কৃষিপণ্য বিশেষত গম, সয়াবিন, শস্যসহ বেশ কিছু খাদ্যপণ্যের বাণিজ্যে অনুৎপাদক ফটকা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিশ্বপুঁজির আগ্রাসী প্রভাবের মুখে ১৯৯২ থেকেই তা তারা শিথিল করতে শুরু করে। যেহেতু খাদ্যসামগ্রী মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, তেল বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি, সেহেতু এর পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনে এগুলো নিয়ে ফাটকাবাজারি, ভবিষ্যৎ বিক্রি (Speculative trading, Future sale) নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ফাটকা পুঁজির ক্রমবর্ধমান দাপটের মুখে ২০০০-এ নতুন আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ আরো শিথিল করা হয়। যুক্তি দেয়া হয় যে, যারা ফটকা বাণিজ্য করে, একই সঙ্গে একাধিক ও বিভিন্ন সময়ের চুক্তির মাধ্যমে (swap deal) মুনাফা অর্জন করে তারাও খাদ্যশিল্পেরই অংশীদার। এসব যুক্তি দাঁড় করিয়ে খাদ্যশস্যসহ সকল পণ্যবাজারে এই পুঁজির তৎপরতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়।

এর মধ্য দিয়ে ২০০২-০৩ থেকে খাদ্য ও জ্বালানি খাতে ফাটকাবাজারি বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ২০০৩ সালে কৃষিপণ্যে এই বিনিয়োগ ছিল ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে তা ২০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হেজ ফান্ডের এক ম্যানেজারের বক্তব্য অনুযায়ী, এটি খুব দ্রুত আরো ৪ গুণ বেড়ে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে পারে পরের কয়েক বছরে। এই ধারায় খাদ্য ও তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি চলতেই থাকবে। ২০০০ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে শিকাগো বোর্ড অব ট্রেডে গমের দাম বেড়ে যায় শতকরা ১৪৭ ভাগ, একই সময়ে চালের দাম বাড়ে ৭৯ ভাগ, সয়াবিন ৭২ ভাগ। এদের শক্তি যত বাড়তে থাকে ততই নিয়ন্ত্রণ কমানোর চাপ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২০০৫ সালে গম, শস্য, সয়াবিনে ফটকা বাণিজ্যের মাত্রা আগের তুলনায় আরো সম্প্রসারিত হয়। ব্যবসায়ীরা আরো বেশি মাত্রায় ভবিষ্যতের বাজার ধরে বায়বীয় কেনাবেচা করতে শুরু করে। আইনি শৈথিল্যের সুযোগে এবং সরকার ও লুটেরাদের যোগসাজশে দাম বাড়তে থাকে নাটকীয়ভাবে। যুক্তিসংগত কারণেই এর অবসান এখনো হয়নি। ফাওয়ের খাদ্য দাম সূচক স্মরণকালের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছেছিল জুন ২০০৮-এ। এরপর সূচক কিছুটা নিম্নগতি পেয়েছিল, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে দাম সূচক আবার সেই সর্বোচ্চ বিন্দুও অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালেও পরিস্থিতির নাজুক অবস্থা সবাই স্বীকার করছেন।

এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতি একক খাদ্যশস্যের শতকরা ১ ভাগ মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বের ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ অনাহারে পতিত হয়। মানুষের ক্ষুধার উপর মুনাফার সৌধ উঁচু হতে থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তা : রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব

২০১০ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এবং বিশ্বব্যাংক দুটো প্রতিষ্ঠান থেকেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছিল যে, ২০১১ সালে খাদ্যদ্রব্যের দাম আরো বাড়বে, পরিস্থিতি ২০০৭-০৮ থেকেও খারাপ হতে পারে। সেটা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের কারণে সম্ভাবনা সব সময়ই অটুট আছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, চাল, গম ও সমজাতীয় খাদ্যশস্য এবং তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে সাথে সাথে ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নতুন করে পতিত হতে হবে। আসলে সব লক্ষণ সে রকমই। কিন্তু এই সাথে এটাও বলা দরকার যে, এরপরও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বৃহৎ পুঁজিমুখী ভূমিকার কোনো পরিবর্তন আমরা দেখি না। উল্লেখ্য যে, দাম বা সংকটবৃদ্ধি সম্পর্কে এসব 'ভবিষ্যদ্বাণী' খাদ্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান ফাটকা বাণিজ্যের

জন্য খুব সহায়ক হয়।

আগের বিশ্লেষণের সারকথা হিসেবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে প্রধান কয়েকটি কারণ শনাক্ত করা যায় এভাবে : ১. কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বহুজাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া। ২. খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ফটকা বাণিজ্যের ভয়ংকর নিয়ন্ত্রণহীন বিস্তার। ৩. কৃষিজমি অকৃষি খাতে স্থানান্তর, খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে লাভজনক অন্য ফসল উৎপাদনের প্রবণতা বৃদ্ধি। ৪. ঝড়, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে খাদ্য উৎপাদনের বিপর্যয়। ৫. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব হ্রাস। সর্বোপরি এইসবের সাথে বাজার দামে প্রাপ্ত খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম মানুষের ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে ।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার সংকটে এই সবগুলো কারণই কাজ করে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিপরীতে নানামুখী অর্থনৈতিক সংস্কার, যার মধ্যে আছে রেশনিং প্রথা বাতিল, সরকারি খাদ্যগুদাম হ্রাস করা, বিএডিসিকে পঙ্গু করা, কৃষি উপকরণ অধিকতর বাণিজ্যিকীকরণ, বীজ প্রাপ্তিতে কোম্পানি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, চালের বদলে অধিক লাভজনক রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহ দান। এসব কথিত সংস্কারের মূল দর্শন হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব হ্রাস করা। উপরন্তু যখন সিন্ডিকেট বলে কথিত কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা জোগানের সম্ভাব্য ঘাটতির সুযোগ নিয়ে দেশের বাজারে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে, কিংবা একটানা চালসহ নানা খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে, তখন সরকার বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কোনো কিছুই করে না।

২০০৬ থেকে জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত বিশ্ববাজারে চাল ও গমের দাম ওঠানামার সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের খাদ্যদ্রব্যের দামের ওঠানামার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সি পি চন্দ্রশেখর ও জয়তী ঘোষ। এই সময়কালে বিশ্ববাজারে গমের দাম সবচেয়ে বেশি ছিল ২০০৮-এর জানুয়ারি-মার্চ মাসে। তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মুম্বাই ও দিল্লির খুচরা বাজারে গমের দাম ২০০৬ সালেই এর কাছাকাছি গিয়েছিল। বিশ্ববাজারে দামের তুলনায় ২০০৮-এর আগে ও পরে মুম্বাই ও দিল্লির দামের অবস্থান সব সময়ই থেকেছে উপরে। একই চিত্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও।

তবে বাংলাদেশে গমের খুচরা দাম সব সময়ই বিশ্ববাজারের দামের থেকে অনেক বেশি। পাকিস্তানেও বেশি, তবে বাংলাদেশের চাইতে কম। শ্রীলঙ্কায় চালের দাম বিশ্ববাজারের দামের চাইতে, ২০০৭-এর কিছু সময় বাদে, বাকি সব সময়ই কম। ফিলিপাইনে ২০০৮ থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ববাজারের তুলনায় দাম কম। চালের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খুচরা দর বিশ্ববাজার থেকে কম থাকলেও ঊর্ধ্বমুখী থেকেছে। ২০০৯-এর কিছু সময় দাম কিছুটা কমলেও এখন গতি ঊর্ধ্বমুখী।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) তথ্য অনুযায়ী, চালে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশে ঘাটতি আছে তবে খুবই কম, শতকরা ৯৭ ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ, শতকরা মাত্র ৩ ভাগ আমদানির উপর নির্ভরশীল। শ্রীলঙ্কাও চালে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার পরও খাদ্যের অভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধির কমতি নেই।

বহু দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, বিপণন অধিক হারে বহুজাতিক পুঁজির বাণিজ্যিক তৎপরতার অধীনস্থ হয়ে যাবার ফলে পুরো কৃষি ও খাদ্যশস্য ব্যবস্থার উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের ভেতর খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফামুখী তৎপরতায় ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য। যেসব দেশ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির নীতিকাঠামো অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতি সাজায় তাদের সবারই একই দশা। বাংলাদেশ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

১২ বছর আগে কৃষি বিশেষজ্ঞ মাহবুব হোসেন কৃত এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ধান, গম, ডাল, সরিষার একক উৎপাদন ব্যয় ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের চাইতে বেশি। এর কারণ হিসেবে তিনি তখন দুটো বিষয় শনাক্ত করেছিলেন। প্রথমত, কম উৎপাদনশীলতা এবং দ্বিতীয়ত, কৃষি উপকরণের দামের পার্থক্য। অন্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সেচ ও সারের ব্যয়ে পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। তখনই বাংলাদেশে সেচ খরচ ছিল হেক্টরপ্রতি ৩২ মার্কিন ডলার, ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে ৩২ ডলার, থাইল্যান্ডে ১৮ ডলার, ভিয়েতনামে ২৬ ডলার। অনুপাত এখনো এ রকমই। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ভারতে বিভিন্ন কৃষি উপকরণে তুলনামূলকভাবে বেশি ভর্তুকি দেয়া হয়। সেচের ক্ষেত্রে ভারতে উল্লেখযোগ্য ভর্তুকি দেয়া হয় বিদ্যুতে। এছাড়া কোনো কোনো দেশে ভর্তুকির মাধ্যমে বৃহদাকার সেচ প্রকল্প স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণও সেচের খরচ কম হবার কারণ।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের তফাৎ হচ্ছে, ভারত নব্বইয়ের দশকে আমদানি উদারীকরণ চালু করেও খাদ্য নিয়ে তা থেকে আবার পিছিয়ে এসেছে। প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক আমদানি নীতি চালু করা ছাড়াও খাদ্যশস্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধানত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার নিয়ন্ত্রণে এনেছে। বাংলাদেশ কোনো পর্যালোচনা করেনি, বা গতিমুখ পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগও নেয়নি।

সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব গুরুত্ব না দিয়ে, যে কোনো মূল্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ থেকেই, পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়ে 'সবুজ বিপ্লব' নাম নিয়ে ইরি বীজ, রাসায়নিক সার, যান্ত্রিক সেচ ও কীটনাশক ওষুধের প্যাকেজ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে উৎপাদন বৃদ্ধিও পেয়েছিল অনেক। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেছে যে, একই পরিমাণ উৎপাদনের জন্য আরো বেশি বেশি পরিমাণ সার, ওষুধ ও পানির প্রয়োজন পড়ছে। ইদানীং একই যুক্তিতে হাইব্রিড ও টার্মিনেটর বীজ, জিএম বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড খাদ্য উৎপাদনের তৎপরতাও বিশ্বব্যাপী অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। এসবের ফলাফল হিসেবে প্রাণবৈচিত্র্য, ফসলবৈচিত্র্যের বিনাশসহ বহু ধরনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদে বড় প্রতিবন্ধক। এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত বৃহৎ কতিপয় বহুজাতিক কোম্পানির হাতে যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার চিত্র আগে কিছুটা বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু এটা নিছক তাদের মুনাফা বৃদ্ধির বিষয় নয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের মধ্য দিয়ে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থাই শুধু বাণিজ্যের উপকরণ হয়নি, মানুষের সুস্থ জীবনই হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তবে গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার কারণে এসব নিয়ে এখন প্রশ্ন, ক্ষোভ ও প্রতিরোধও সৃষ্টি হয়েছে অনেক।

Empires of Food গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্র ও

জাপানের মতো শিল্পোন্নত দুটো দেশের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যেখানে বিধি, প্রতিষ্ঠান সবকিছুই অনেক শক্তিশালী। ১০ বছর আগের হিসাবেই তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-উপরিস্থিত পানির শতকরা ৩৬ ভাগ মানুষের পানের জন্য তো নয়ই, প্রাণিকুলের সুস্থভাবে বেঁচে থাকারও উপযোগী নয়। এই অবস্থা তৈরি হয়েছে আধুনিক রাসায়নিক কৃষি সৃষ্ট বিষাক্ত পানির শতকরা ৭০ ভাগ মূল পানিপ্রবাহে মিশে যাবার কারণে। ১৯৫০-এর দশক থেকেই জাপান বোরলগ উদ্ভাবিত বীজের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে, কিন্তু সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনের আনুষঙ্গিক ব্যয় বাড়তে থাকে বহুগুণ বেশি হারে। লেখকরা একক হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে, ১৯৫০ সালে প্রতি ক্যালরি খরচ করে উৎপাদিত হতো ১.২৭ ক্যালরি। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালেই তা নেমে প্রতি ক্যালরি খরচ করে উৎপাদন দাঁড়ায় ০.৩৮।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিরিক্ত আর্সেনিক সনাক্ত করা হয়, যার কারণে প্রায় ৩ কোটি মানুষ এখন খাবার পানি নিয়ে নতুন সংকটের মুখে। ভূ-উপরিস্থিত পানির দূষণ, প্রাকৃতিক মৎস্য চাষের ক্ষতি, মাটির উর্বরতা হ্রাস–এগুলো সবই ক্রমবর্ধমান রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফল। বীজ ক্রমেই কোম্পানির দখলে যাচ্ছে। বেশি উৎপাদনের লোভ দেখানো হলেও প্রায়ই পুরো ফসল বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে এসব বীজের কারণে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ডাল, পেঁয়াজ, চিনিসহ অনেক খাদ্যসামগ্রী এখন আমদানি বাণিজ্যের অধীন। পুরো ব্যবস্থাটাই এমন দাঁড়িয়েছে যে, লাভ কোনো কোনো ব্যক্তির, ক্ষতি সকলের। দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্য জোগানও নিশ্চিত নয়, যতটা জোগান আছে তা-ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। উপরন্তু কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্য যা দাম পাচ্ছে, ভোক্তাকে কিনতে হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি দামে। আবার খাদ্য সরবরাহ সংগঠিত চাঁদাবাজির শিকার।

সামগ্রিক তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে আশা করি এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, একটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে দুটো শর্ত পূরণ অপরিহার্য। প্রথমত, খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হলো, চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও সকলের জন্য ন্যূনতম সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে যথাযথ বাস্তবায়নযোগ্য নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, সংস্থা প্রতিষ্ঠা, জীববৈচিত্র্য, পানি ও মাটির উপযোগী বীজ ও কৃষি উপকরণ গবেষণা এবং জোগান নিশ্চিত করা। সর্বোপরি এসবের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও এখতিয়ার নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, দেশের সকল নাগরিকের প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য সংগ্রহের মতো ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করা। জনগণের কোনো অংশের মধ্যে বা কোনো অঞ্চলে এর ঘাটতি থাকলে, তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সাথে বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য খাতও, বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে

যথেষ্ট খাদ্য এই ধরিত্রী, বাংলাদেশে মাটি-পানি-মানুষ জোগান দিতে সক্ষম। অথচ উন্নয়নের নামে এই মাটি-পানিই বিনষ্ট হয়, মুনাফার নানা আগ্রাসনে মানুষ খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা বা প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকার অবস্থা থেকেও দূরে থাকে! জমি, পানি ও খাদ্য কি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের কাজে লাগবে, না দেশি-বিদেশি দানবদের মুনাফার অসীম ক্ষুধার শিকার হবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি।

পরিচালিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, বাজার ও মুনাফামুখী তৎপরতার অধীনস্থ হয়ে গেছে। রেশনিং বাতিল করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ কমানো হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সংস্থা দুর্বল করা হয়েছে। মানুষের জন্য ন্যূনতম খাদ্য নিশ্চিত করা এবং জাতীয়ভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়-দায়িত্ব বা এখতিয়ার রাষ্ট্র তার নিজের হাতে রাখেনি।

একটি দেশে যতদিন একজন মানুষও অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়, ততদিন সেই দেশকে সভ্য বা গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায় না। সেখানে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই তার ন্যূনতম খাদ্যপ্রাপ্তির অভাবে কখনো না কখনো অনাহারে থাকছে। সংবাদপত্রে খবর হচ্ছে ভাত চুরির অপরাধে শিশু পুত্র কন্যা সবল পুরুষদের আক্রমণের শিকার, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা, নিজের সন্তান বিক্রি বা হত্যা, মঙ্গা, নীরব দুর্ভিক্ষ; অনাহারে-অর্ধাহারে অসংখ্য মানুষের রাতের পর রাত পার করা।

এই অসভ্য অগণতান্ত্রিক অশ্লীল পরিস্থিতি থেকে কি মুক্তি সম্ভব নয়? খুবই সম্ভব। যথেষ্ট খাদ্য এই ধরিত্রী, বাংলাদেশে মাটি-পানি-মানুষ জোগান দিতে সক্ষম। অথচ উন্নয়নের নামে এই মাটি-পানিই বিনষ্ট হয়, মুনাফার নানা আগ্রাসনে মানুষ খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা বা প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকার অবস্থা থেকেও দূরে থাকে! জমি, পানি ও খাদ্য কি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের কাজে লাগবে, না দেশি-বিদেশি দানবদের মুনাফার অসীম ক্ষুধার শিকার হবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, দেশে দেশে এবং বাংলাদেশে জনগণের লড়াই ও তার শক্তির বিকাশ ছাড়া এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: anujuniv@gmail.com

বিস্তারিত জানার জন্য আরো দেখুন :

Ann-Christian sjolander Holland: The Water Business, Zed books, 2005

National Geographic: A special issue on Water, April 2010.

http://www.ciel.org/Ifi/Bechtel_Lawsuit_12Feb03.html.

http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/VANOVEDR/

Financializing Food: Deregulation, Commodity Markets and the Rising Cost of Food: (http://www.globallabour.info/en/2008/07/financializing_food_deregulati.html)

Evan D.G. Fraser and Andrew Rimas: Empires of Food, Free Press, NY, 2010

CP Chandrashekhar & Jayati Ghosh: The Transmission of Global Food Prices http://www.networkideas.org/news/mar2011/news22_Transmission.htm

আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, শ্রাবণ, ২০০০।

আনু মুহাম্মদ : বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, ২য় সংস্করণ, সংহতি, ২০০৭।

আনু মুহাম্মদ : কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ, সংহতি, ২০০৮।

মাহবুব হোসেন : 'বাণিজ্য উদারীকরণ এবং বাংলাদেশের শস্যখাত', বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৪১০

ফরিদা আখতার : বিকৃত বীজ, ঐতিহ্য, প্রবর্তনা, ২০০৯।

বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, অর্থ মন্ত্রণালয়।